সপ্তম অধ্যায়

সংস্কার ও কুসংস্কার

সপ্তম অধ্যায়

সংস্কার ও কুসংস্কার

বাংলা ভাষার 'সংস্কার' শব্দটি সংস্কৃত ভাষা থেকে গৃহীত। মানবসভ্যতার আদিকাল থেকে বাঁচার জন্যে মানুষ সংগ্রাম শুরু করেছে, সেদিন থেকে সংস্কারেরও জন্ম হয়েছে। জীব জন্তুর সঙ্গে, প্রাকৃতিক বিভিন্ন দুর্বিপাকের সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে মানুষ কখনও জয়ী কখনও বা পরাজয়ের গ্লানি বরণ করেছে, অথচ জয়ের বাসনায় মানুষের জয়যাত্রা। তাই যাত্রাকালে বিভিন্ন ধরনের সংকেত লক্ষ্য করে ধীরে ধীরে ভালোমন্দ নির্ণয় করতে থাকে। এই অভিজ্ঞতা থেকেই জন্ম হয় সংস্কার। এ বিষয়ে ডঃ বরুণ চক্রবর্তী যা বলেছেন তার মমার্থ হল এই যে— "প্রাচীনকালে আদিম মানুষেরা শিকার করতে গিয়ে নানা সংকেত লক্ষ্য করতে থাকে। বারংবার একই অভিজ্ঞতা থেকেই এই সংকেতগুলি সংস্কারে পরিণত হয়েছে। যেমন আকাশের বিদ্যুৎ চমকানি, নক্ষত্রের স্খলন, ভূমিকম্প ইত্যাদি। পরবর্তীকালে মানুষ যতই সভ্য এবং উন্নত হতে থাকে, ততই পরিণামের সঙ্গে কল্পিত সংকেতগুলোর যোগাযোগকে স্পষ্টতর করে নিতে থাকে।"[১] শিক্ষার অভাবে বিশেষ করে উপজাতি ও আদিম গোষ্ঠী সম্বলিত এলাকা, পল্লীবাংলায় সংস্কারের প্রাধান্য আজও প্রবল— শিক্ষিত সমাজেও সংস্কার কিছু কিছু ক্ষেত্রে এখনও সমানভাবে ক্রিয়াশীল।

সংস্কার সম্বন্ধে Carveth Read বলেছেন, **"Superstition means in common use false beliefs concerning supernatural powers, especially such as are regarded as socially injurious and particulars as leadinng to obscuranitism or cruelty. "Superstition" then, is here used merely as a collective term for the subject........... Magic (or the belief in occult forces) and Animism (or the belief in the activity of spirits)."**[২] এ প্রসঙ্গে Melville J. Herskovits বলেছেন, **"Superstitions are, however, but beliefs of which there is no longer a whole-hearted acceptance. They are practices that are followed without conviction, but with an uneasy feeling that it will do no harm to carry them out, if by chance we thus get on the good side of powers whose existence we may at times doubt"**[৩]

প্রাচীনকালে পশুপাখি, গাছপালা, পাথর, মাটি, সূর্য ও চন্দ্র ইত্যাদি সব কিছুর মধ্যেই আত্মা বিদ্যমান এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়ে পড়ার মতবাদের নাম সর্বপ্রাণবাদ। এর অনেক বিভাগের মধ্যে Animatism হল একটি। যার সম্পর্কে লুইস স্পেন্স বলেছেন, **"One of these is the belief in what is known as Animatism, that is, the notion that every object in the natural world is a living and sentiment being in the same sense that man himself is."** [৪]

'আত্মা' এই কথাটি আবিষ্কার করে আদিমমানব বিশ্বাসী হয়ে যায় যে, ব্যক্তির জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় দেহমধ্যস্থ আত্মার জন্য। এই মৃতের আত্মা অনিষ্টকারীর কাছে প্রেতাত্মায় পরিণত হয়। এইভাবে যেমন সর্ববস্তুতে জীবন আছে এই বিশ্বাসে পৌত্তলিকতার সৃষ্টি, অন্যদিকে সৎ ও অসৎ ইত্যাদি সৃষ্টিকারী অপদেবতার উপর বিশ্বাস জন্মায়। এইসব সংস্কার থেকেই জন্ম হয় 'মানা'র। মানা কাকে বলে? উত্তরে বলা যায়— **"A kind of transcendental force, mana is thought to be the spirit that pervades all objects and things and is responsible for the good and the evil in the universe."** [৫] এই "মানা" নামক ক্রিয়ানুষ্ঠান দুভাবে অনুষ্ঠিত হত— সর্বজনীন ও ব্যক্তিবিশেষে। "ব্যক্তি বিশেষ 'মানা' ধারণ করে, এই শক্তির বলে ভালো ও মন্দ উভয়বিধ কাজই করতে পারতো। প্রকৃতপক্ষে এরাই আদিম সমাজে ঐন্দ্রজালিক বলে অভিহিত হতো।" [৬]

প্রাচীন ও আধুনিক জনসমাজের মধ্যে প্রচলিত বহুবিধ প্রথা ও লোকসংস্কারের মূলে রয়েছে টোটেমবাদ। টোটেম প্রসঙ্গে ফ্রয়েড বলেছেন, **"What is totem? It is as a rule an animal (whether edible and harmless or dangerous and feared) and more rarely a plant or a natural phenomenon (such as rain or water) which stands in a peculair relation to the whole clan."** [৭] এই টোটেমবাদের শ্রেণীবিভাগ বলতে গিয়ে J. G. Frazer বলেছেন, **"Totems are at least three kinds : (1) the clan totem, common to a whole clan, and passing by inheritance from generation to generation; (2) the sex totem, common either to all the males or to all the females of the tribe, to the exclusion in**

either case of the other sex: (3) the individual totem, belonging to a single individual and not passing to his descendants.........." (৮)

এইভাবে টোটেমবাদ একদিকে ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যবস্থা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। যেমন গোত্র টোটেমকে গোত্রের সকল সদস্যই যথাযোগ্য সম্মান করে। তারা বিশ্বাস করে আদিকাল থেকে এই টোটেম তাদের রক্ষাকর্তা, এর ফলে সামাজিক ভ্রাতৃত্ববন্ধন, সংহতি সৃষ্টি হয়। আমাদের দেশে যে সাঁওতাল অধিবাসী রয়েছে তাদের প্রতিটি গোত্র উদ্ভিদ, জন্তুজানোয়ার ও বস্তুবিশেষের নামে নামাঙ্কিত। এদের কাছে টোটেম প্রাণী ভক্ষনযোগ্য কিন্তু ক্ষতিকারক জীবজন্তুকে এরা টোটেম হিসেবে পূজো করে। হিন্দুদের মধ্যে তুলসী, বেল, বটগাছের পাতা যেমন পবিত্র, আবার কাক, বিড়াল পরিবারের অমঙ্গলকর জীব বলে তাদের পবিত্র রূপে দেখে। যদিও এর মধ্যে টোটেমবাদের সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় না। সুতরাং টোটেমবাদ হল— "আদিম মানুষ আত্মরক্ষার তাগিদে জন্তু জানোয়ার, গাছপালা ইত্যাদির উপর নির্ভর করেছে। তাই টোটেম বাদ হল মানুষের সঙ্গে পরিবেশের একটা সহানুভূতিসূচক অন্তরঙ্গ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার প্রয়াস। একই টোটেম সম্ভূত প্রত্যেক লোকই জ্ঞাতি অর্থাৎ একই পরিবারভুক্ত এবং এই পরিবারের সবচেয়ে দূর সম্পর্কের জ্ঞাতির সঙ্গেও যৌন-সম্পর্ক স্থাপনের পক্ষে একটি বিরাট বাধা বর্তমান।" (৯) আত্মরক্ষার তাগিদে সৃষ্টি হয় টাবু। টাবু দেবতাদের থেকেও প্রাচীন। টাবু-প্রচলিত নিষেধ অমান্য করলে তার চরম শাস্তি অবশ্যম্ভাবী। যেমন কোন নিরপরাধ ব্যক্তি নিষিদ্ধ কোন পশু হত্যাকরে মাংস ভক্ষণ করল। যখন জানতে পারে তখনই সে ভাবে যে তার নিস্তার নেই এবং সে মুষড়ে পড়ে সত্যি সত্যিই মারা গেল। তাই যা কিছু পবিত্র, অসাধারণ এবং সেই একই সঙ্গে সাংঘাতিক অশুচি ও অদ্ভুত— তাই টাবু। যে ব্যক্তি টাবু নিয়ম ভাঙে সেও টাবু হয়ে যায়। সেই ব্যক্তিকে অন্যান্যরা এড়িয়ে চলে, ছোঁয় না— সৃষ্টি হয় ছোঁয়া-ছুঁয়ি।

সংস্কারের উৎসে ধর্মীয় নির্দেশ বা আচারের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। প্রাচীন ঋকবেদেও এর উদাহরণ মেলে। পেঁচার ডাক অমঙ্গলসূচক, তা দুরীকরণের জন্যে ১০ম মন্ডলে ১৬৫ সূক্তে বলা হয়েছে—"যদুলুকো বদতি মাঘমেতদ্ যৎ কপোতঃ পদমগ্নৌকৃণৌতি। যস্য দূত প্রহিত এষ এতৎ তস্মৈ যমায় নমো অস্ত মৃত্যবে।" (১০)

তিনহাজার বছর আগেও পেঁচার ডাককে যমের দূতের মত মনে করা হত। আজ আমরা এটিকে কুসংস্কার বলি, তা সত্ত্বেও রাতে পেঁচার ডাক শুনলেই মনটা কেমন অশুভ সংকেতে শিউরে ওঠে। সংস্কার বা বিশ্বাস কখনও ব্যক্তিগত হয় আবার লোক সমাজের জীবনাচরণে কার্যকরীভাবে প্রকাশও পায়। ব্যক্তিগত সংস্কার বিশ্বাস সমাজে প্রযুক্ত হলে তা হয় লোক সংস্কার। ব্যক্তিগত সংস্কার সেই ব্যক্তির নিজস্ব আবিষ্কার। যেমন আমরা প্রত্যেকে জীবনে সাফল্য চাই, অভীষ্ট লাভের জন্যে আমরা নানা সংস্কারের বশবর্তী হই। যে কোন বিষয়ে কোন ব্যক্তি নিজে বিশ্বাস করতে পারে। যেমন এখনও কেউ কেউ মনে করে যে যদি ডুমুরের ফুল দেখতে পায় তাহলে সে রাজা হবেই। এই বিশ্বাস কিন্তু সমাজে কেউ স্বীকৃতি দেয় না— তাই এটি সংস্কার নয়।

সামাজিক প্রথা সৃষ্টি হয় সংস্কার থেকেই। বিভিন্ন সংস্কারের মধ্যে বিভিন্ন ক্রিয়া থাকতে পারে। একাধিক ক্রিয়া থাকলে তা অনুষ্ঠানে পরিণত হয়। বাঙালীর বিভিন্ন উৎসব, পাল-পার্বণে এর প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

সব সংস্কার অর্থহীন নয়। যুক্তিগ্রাহ্য সংস্কার অনেক আছে, যেগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল প্রকৃত কারণ গোপন রেখে অন্যবিধ কারণের উল্লেখ। যেমন স্বর্ণালংকার হারালে অমঙ্গল হয়। এর কারণ সোনা অত্যন্ত মূল্যবান ধাতু। যাতে ব্যবহারকারী অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করে তার জন্যেই এই সংস্কারটির উদ্ভব। আবার, আমাদের দেশে গর্ভবতী মায়েদের উপর নানাবিধ নিষেধ আরোপিত হয়ে থাকে। সদ্যোজাত সন্তানের দৈহিক ও মানসিক গঠনে গর্ভবতী মায়েদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। পাশ্চাত্য দেশেও এই সংস্কার চালু আছে। প্রসূতি ভূমিকা প্রসঙ্গে Encyclopaedia গ্রন্থে বলা হয়েছে— **"Birth marks on a baby's face or body are often said to be caused by something seen or touched by the mother during her pregnancy."** (১১)

দিন, বার, মাস, বস্তু, ধাতুর নাম ইত্যাদি সংস্কার দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে আছে। তুক-তাক, ব্রত প্রভৃতি বহু সংস্কার বর্তমানে ব্রতে পরিণত হয়েছে। এদের মধ্যে কিছু ভাল, কিছু মন্দ। যেমন তারাশঙ্করের "কালাপাহাড়" গল্পের নায়ক রংলাল পাঁচুন্দির হাট থেকে ১৯৮ টাকায় দুটি মোষ কালাপাহাড় এবং কুম্ভকর্ণ কিনে আনে। স্ত্রী যশোদার মা ওদের পায়ে জল, শিং-এ তেল-হলুদ মাখিয়ে বরণ করে নিয়েছে ঘরে। রাঢ়-বাংলার একটি নিজস্ব প্রথা এই "বরণ"। এছাড়া ধর্মরাজ ঠাকুরের কাছে মানত করে লোকে মাটির ঘোড়া দেয়। অম্বুবাচীর দিন ধরিত্রী নাকি ঋতুমতী থাকেন তাই হল কর্ষণ বন্ধ থাকে। কৃষকদের বিশ্বাস ঐদিনে ধরিত্রী রজঃস্বলা হন। বাংলাদেশে হিন্দুসমাজে লক্ষ্মীব্রত মহাসমারোহে পালিত হয়। মেয়েরাই এই ব্রত নির্বাহ করে থাকেন। এই ব্রত গুলির সঙ্গে ব্রতচারিণীর মনে ভাল শস্যোৎপাদনের আকাঙ্খা যে সম্পৃক্ত

— তা সুস্পষ্ট। বিদেশেও এই ব্রত আছে। মেক্সিকোয় কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর সময় মেয়েরা মাথার চুল আলুলায়িত করে রাখে, উদ্দেশ্য হল কেশ গুচ্ছের মত শস্য যেন গুচ্ছ গুচ্ছ উৎপাদিত হয়। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এখানকার মেয়েদের সম্বন্ধে বলেছেন, **"The woman of the village wore their hair unbound, and shook and tossed it, So that by sympathetic magic the maize might take the hint and grow correspondingly long."** (১২) সব কিছুর মতই সংস্কারও যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়। একযুগে যা ছিল জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত, পরবর্তীযুগে সেগুলি শুধু পরিত্যক্তই হয় না, সেগুলিকে আমরা কুসংস্কার বলি। ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী তাই বলেছেন— "বিজ্ঞানের আলোয় আজ আমরা অনেক আচার-ব্যবহার ও বিশ্বাসকে কুসংস্কার বলছি। কিন্তু একদিন ছিল যখন এগুলি ধর্মকর্ম ও ধর্ম বিশ্বাসের ন্যায় সকলের শ্রদ্ধার সামগ্রী ছিল।"(১৩)

কুসংস্কার ঃ- যুক্তিহীন আচার পালনই কুসংস্কার— যার জন্ম বস্তুতঃ যুক্তিহীন অন্ধ বিশ্বাস থেকে। মানুষ যখন যুক্তির চেয়ে আবেগকে প্রাধান্য দেয় তখনই বিভিন্ন উদ্ভট সমস্যার জন্ম হয়। এই আবেগকে কাজে লাগিয়ে সাধারণ মানুষকে শোষণ ও পরিকল্পিতভাবে বিভ্রান্ত করেছে, বিপথগামী করেছে শাসক শ্রেণী। শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে, কুসংস্কার আজও বাসা বেঁধে আছে। কুসংস্কার শাসক শ্রেণী নিজস্বার্থে জীইয়ে রেখেছে। "শোষক শ্রেণী কখনই চাইতে পারে না সাধারণ মানুষের চেতনাকে যুক্তিনিষ্ঠ করতে, বেশি দূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে"। (১৪) কারণ সাধারণ যদি যুক্তিনিষ্ঠ হয়ে যায় তাহলে শাসক ও শোষক সম্প্রদায়ের অন্যায় ধরা পড়ে যাবে। সমাজের বুকে নিজেরা জীবন্ত ঈশ্বর সেজে থাকতে পারবে না। এছাড়া ব্যক্তিস্বার্থ ও গোষ্ঠী স্বার্থেও কুসংস্কার টিকে রয়েছে। সেই সঙ্গে পরিবেশ বাধ্য করাচ্ছে কুসংস্কারকে মেনে নিতে। যেদিন থেকে সংস্কারের সৃষ্টি হয়েছে সেদিন থেকেই কুসংস্কারের জন্ম হয়েছে। এই কুসংস্কার কি বা কাকে বলে? এ ব্যাপারে আব্দুল হাফিজ বলেছেন, "কোন একটি বিশেষ লোকসংস্কার যখন সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের দরুন অপ্রচলিত হয়ে যায় কিংবা লোকজীবনে যখন তার আর কোন কার্যকরী জীবন্ত ভূমিকা থাকে না, তখন তা কুসংস্কার নামে অভিহিত হয়"। (১৫) এ বিষয়ে এ, এইচ ক্রাপের বক্তব্য হল, **"Superstition, in common parlance, designates the sum of beliefs and practices shared by other people in so far as they differ from our own. What we believe and practice ourselves is, of course, Religion".**(১৬) অর্থাৎ নিজের ধর্ম ও বিশ্বাস ছাড়া অন্যের ধর্ম ও বিশ্বাসকে অন্ধ কুসংস্কার বলেই মনে করে। আবার স্থানবিশেষে বা যুগ পরিবর্তনের সাথে সাথে কোথাও যে বিশ্বাস প্রচলিত, সেটাই আবার কোথাও কুসংস্কার। যেমন একই হিন্দুধর্মের লোকদের মধ্যে অঞ্চলভেদে সংস্কারের প্রতি বিশ্বাস ও অবিশ্বাস দেখা যায়। ক্ষিতিমোহন সেন তাই বলেছেন, " হিন্দুর মধ্যে দিবা-বিবাহও আছে, রাত্রিতে বিবাহও আছে। এই দেশে প্রদেশ-ভেদে মাতুল কন্যা বিবাহ আছে, আবার তাহাতেই জাতি যায় এমন স্থানও আছে। এক সময় গো-বধও এখানে চলিত, এখন সেই নামে লোকে শিহরিয়া উঠে।" (১৭)

গোষ্ঠীপতি বা শক্তিশালী ব্যক্তি অন্যের উপর আধিপত্য বিস্তার করতেই এইসব অন্যায় কুসংস্কারের জন্ম দিয়েছে। কুসংস্কার যতদিন সমাজে থাকবে ততদিন শ্রেণী চেতনা বা শ্রেণী সংগ্রাম ঘটবে না, ধর্মের দোহাই দিয়ে সহজ সরল অশিক্ষিত দরিদ্রদের বোকা বানানো যাবে না। তাই প্রবীর ঘোষ বলেছেন— "কুসংস্কার ও জাতপাতের বিশ্বাস যতদিন শোষিত মানুষগুলোর চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে রাখবে ততদিন শ্রেণী সংগ্রাম চূড়ান্ত পর্যায়ের দিকে এগোতে পারবে না, শোষিত একটি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আর একটি গোষ্ঠীর অবিশ্বাস ও ঘৃণাকে যতদিন বজায় রাখা যাবে, ততদিন তাদের মধ্যে শ্রেণী চেতনা, শ্রেণী সংগ্রাম চূড়ান্ত রূপ পাবে না। শ্রেণী চেতনা বৃদ্ধি পেলে কুসংস্কার, জাতপাতের মত বিষয়গুলো দূরে সরে যায়।" (১৮) কুসংস্কার কখনই সমাজে অভিপ্রেত নয়। চিরায়ত বিশ্বাস দূর করতে হবে। এর জন্যে চাই সর্বজনীন শিক্ষার বিস্তার। শিক্ষিতের সংখ্যা যত বাড়বে কুসংস্কারের বিষময় পরিণাম ধীরে ধীরে অবলুপ্তির পথে যাবে। যে কোন বিশ্বাস একজন নিরক্ষর মানুষের কাছে আমৃত্যু অন্ধত্বের পর্যায়ে থাকে, অথচ শিক্ষিত ব্যক্তি প্রথমে বিশ্বাস করলেও ধীরে ধীরে তাকে যুক্তির আলোকে যাচাই করতে শেখে। যেমন শূদ্ররা পিতা মাতার মৃত্যুর পর এক মাস অশৌচ পালন করত, কন্যা সন্তান হলে একমাস ও পুত্র সন্তান হলে একুশ দিন আঁতুড় হিসেবে অশৌচ পালন করত। সেই পরিবারের বর্তমান শিক্ষিত প্রজন্ম মৃত্যুর পনেরো দিনেই শ্রাদ্ধ শান্তি করে শুদ্ধ হয়। অনেকে পিতা-মাতার মৃত্যু হলে এক বছর নগ্ন পায়ে থাকত; বর্তমানে তা প্রায় পরিত্যক্ত হয়ে গেছে।

জাতিভেদ প্রথা

এরপর জাতিভেদ প্রথা। জাতিভেদ প্রথা সমাজে কুসংস্কার সৃষ্টির পক্ষে সহায়কের ভূমিকা নিয়েছে— বিশেষ করে এই ভারতবর্ষে। প্রাচীন ঋকবেদে জাতিভেদের উল্লেখ আছে (পুরুষসূক্তে)। গীতায় শ্রীভগবানের উক্তি ও এ বিষয়ে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, "চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম বিভাগশঃ ৪/১৩। অর্থাৎ আমি গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে

চারিবর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি। এগুলি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বলা বাহুল্য। যেদিন থেকে চতুবর্ণের সৃষ্টি হল সেদিন থেকেই সৃষ্টি হল জাতিভেদ, অশুচি, অস্পৃশ্যতার বাতাবরণ। এছাড়া বিভিন্ন বর্ণের নরনারীর যৌন মিলনের ফলে অনেক বিচিত্র সঙ্কর জাতির সৃষ্টি হয়। সুতরাং চতুর্বর্ণই একমাত্র জাতি নয় বা জাতিভেদ সৃষ্টিকারী নয়। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন, "এই চাতুর্বর্ণ্য প্রথা অলীক উপন্যাস, এ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। কারণ ভারতবর্ষে এই চাতুর্বর্ণের বাহিরে অসংখ্য বর্ণ, জন ও কোম বিদ্যমান ছিল। প্রত্যেক বর্ণ, জন ও কোমের ভিতর আবার ছিল অসংখ্য স্তর উপস্তর।" (১৯) তাই জাতিভেদ প্রথার প্রকৃত স্বরূপ চতুর্বর্ণের মধ্যে সম্পূর্ণ পাওয়া যাবে না। সেইজন্যে শ্রীনিবাস মন্তব্য করেছেন, **"....the influential concept of varna successfully obscured the dynamic features of caste during the traditional or Pre-British period."** (২০ক)

উনবিংশ শতাব্দীতে জাতিভেদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু হয়। যদিও সনাতন হিন্দুদের কাছ থেকে এই প্রথার বিরুদ্ধে বিপুল সাড়া পাওয়া যায় নি। রামমোহন প্রতিষ্ঠিত "আত্মীয় সভা"তে এই প্রথার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ আলোচনা হতে দেখা যায়। রামমোহন একদা এক জনৈক ব্যক্তিকে এক পত্রে লেখেন, **"....I regret to say that the present system of religion adhered to by the Hindus is not well calculated to promote their political interests. The distinction of Castes introducing in numerable divisions and sub-divisions among them, has entirely deprived them of patriotic feeling, and the multitude of religious rites and ceremonies and the laws of purification have totally disqualified them from undertaking any difficult enterprise."**(২০খ) ব্রাহ্ম সমাজের যে 'ট্রাস্ট ডীড" রামমোহন করেছিলেন তাতেও জাতিভেদ প্রথার বিরোধী মনোভাবের পরিচয় মেলে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর জাতিভেদের বিরোধী ছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, হঠাৎ করে শত শতাব্দী লাঞ্ছিত জাতিভেদ প্রথার বিলুপ্ত সম্ভব নয়। তবে তিনি আশা ব্যক্ত করেছিলেন, যে ধীরে ধীরে এর বিলোপ ঘটবে। তিনি রাজনারায়ণ বসুকে এক পত্রে বলেছিলেন, " এক্ষণে এমত সময় উপস্থিত হয় নাই, যাহাতে জাতিভেদ ভঙ্গ করা যায়। কিন্তু ক্রমে ক্রমে কালে যে জাতিভেদ থাকিবেক না তাহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে; যেহেতু নানা ঘটনা সেই জাতিভেদ ভঙ্গ বিষয়ে উন্মুখ হইয়াছে।" (২০গ)

জাতিভেদের সংস্কার দূর করার জন্যে কেশবচন্দ্র সেন অসবর্ণ বিবাহ ও উপবীত-বর্জন কার্যসূচী গ্রহণ করেছিলেন। এর ফলে ১৮৭২ সালে "তিন আইন" বিধিবদ্ধ হয়— যেখানে অসবর্ণ বিবাহ স্বীকৃত হয়।

কিন্তু দুঃখের বিষয় আজও বৃহত্তর সমাজ থেকে জাতিভেদের কুসংস্কার নিশ্চিহ্ন হয় নি। বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও জাতিভেদের অভিশাপ আমাদের সমাজে জগদ্দল পাথরের মত রয়ে গেছে। উনবিংশ শতকের শেষার্ধে সমাজ -সংস্কারক শিবনাথ শাস্ত্রী এ প্রসঙ্গে যথার্থ মন্তব্য করেছিলেন— " জাতিভেদের ফলেই আমাদের দেশের মানুষ মনুষ্যত্বহীন ও কাপুরুষ। আমাদের বিবাহ রীতিও ঐ প্রথার জন্যে অদ্ভুত ও ক্ষতিকারক। বাল্যবিবাহেরও অন্যতম কারণ জাতিভেদ। "(২০ঘ) 'শিবনাথের মতে জাতিভেদ প্রথা অধর্মের ওপরই প্রতিষ্ঠিত'।

বাংলাদেশে বল্লাল সেনের আমল থেকেই কৌলিন্য প্রথাকে কেন্দ্র করে জাতিভেদ প্রথা আরও জোরদার হয় ব্রাহ্মণগণ নিজেদের খেয়াল খুশীমত সমাজে জাতিভেদ প্রথা, অস্পৃশ্যতার বাতাবরণ তৈরী করে নিজেদের আধিপত্য ও স্বার্থ বজায় রেখেছিল। তারপর সামন্ততন্ত্রের যুগে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে নেমে আসেন সামন্ত ও জমিদারগণ। জাতিভেদ প্রথার সঙ্গে তাঁরা কুসংস্কার জীইয়ে রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। সাধারণ শ্রেণীর মধ্যে ধর্মের দোহাই দিয়ে এবং নানা কুসংস্কারের প্রশ্রয় দিয়ে তাদের বোকা বানিয়ে রাখতে শাসকশ্রেণী ছিলেন বদ্ধপরিকর। ধীরে ধীরে ধনতন্ত্র ও আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার আবির্ভাবে সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয় শুরু হয়, নেমে আসে অর্থনৈতিক দুরবস্থা; ক্ষুধার জ্বালায় নিরক্ষর মানুষের জীবনে সৃষ্টি হয় নানা আচার অনুষ্ঠানের এবং গ্রাম্য শান্তি শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ে। তাছাড়া রাঢ় বাংলায় নানা উপজাতি আসত। যেমন— ইরাণী, যাযাবর, বেদে, যাদুকরী সম্প্রদায়। যাযাবর জীবন যাত্রার ফলে তাদের মধ্যে নগ্ন আদিম ক্ষুধাই কেবল সম্বল হয় এবং তার প্রভাব রাঢ়ের নীচুতলার মানুষদের মধ্যেও পড়ে। এইসব যাযাবর শ্রেণী নিজেদের বেঁচে থাকার তাগিদে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে নানা ধর্মীয় বা যাদুবিদ্যার ভেল্কী দেখিয়ে রোজগার করার চেষ্টা করত।

বাংলাদেশে শাক্ত ও বৈষ্ণব পাশাপাশি রয়েছে, ফলে এই সমাজে নানা সংস্কার, কিংবদন্তী, বিশ্বাস, অধ্যাত্মচেতনা ও সাধনা সবই বিরাজ করেছে। সেইসঙ্গে রয়েছে তন্ত্রসাধনা— যার সাহায্যে মৃত্যুকে জয় করার এষণা, ধনী হবার বাসনা ছিল প্রকট। তারাশঙ্কর নিজেও একজন শাক্ত ছিলেন। "ধাত্রীদেবতা" উপন্যাসে শিবনাথ বলেছে, "আমাদের দেশটাই হল তান্ত্রিকের দেশ, এককালে তন্ত্রসাধনার মহা সমারোহ ছিল আমাদের দেশে।" (২১) এ গৌরবে তারাশঙ্করও গৌরবান্বিত

ছিলেন। তারাশঙ্কর ছিলেন একজন সামন্ত ও লেখক। ক্ষয়িষ্ণু জমিদারগণ কীভাবে দেবতা ও নানা আচার-অনুষ্ঠানের বিশ্বাসী হয়ে পড়েন তা লেখক নিজের চোখে দেখেছেন।

"সে কালে দুর্বল জমিদাররা মনস্কামনা সিদ্ধির আশায় দেবতার দুয়ারে মানত করতেন, নানা ব্যর্থতায় অপমানে লাঞ্ছিত হয়ে দেবতার নিকট সান্ত্বনা ভিক্ষা করতেন—বাল্যে তারাশঙ্কর তা দেখেছেন।" (২২) তারাশঙ্করের নিজের চুল মানত করা ছিল বৈদ্যনাথ ধামে। লেখক নিজেও প্রথম জীবনে ছিলেন যাযাবর প্রকৃতির। সেইসূত্রে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং নিজের চোখে বহু কুসংস্কার ও সংস্কার দেখেছেন। ঋজুদর্শী লেখক বহুগল্প কুসংস্কারের আধারে রচনা করেছেন। যেমন—ভূতে পাওয়া, ডাইনীতে পাওয়া, ভরপাওয়া, বাণমারা, জলপড়া, মন্ত্র-তন্ত্র নির্ভর ইত্যাদি।

কুসংস্কার সমাজে ও ব্যক্তিজীবনে বহু ক্ষতি করে তা বর্তমান সমাজে আজও বিদিত। তা সত্ত্বেও এ সব কুপ্রথা নিবারণ করতে প্রশাসন সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসেনি। সমাজেরই নিম্নস্তরের বাসিন্দা সেই সাঁওতাল, বাউরী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে আজও এইসব কুসংস্কার ক্রিয়াশীল। কুসংস্কার স্বার্থান্বেষী মানুষেরই সৃষ্টি এবং সমস্ত ব্যাপারটাই যে আসলে বুজরুকী তা বিজ্ঞানী ও নব্য ডাক্তারগণ স্বীকার করেছেন— "চিকিৎসা বিজ্ঞান ভূত পাওয়া বলে পরিচিত মনের রোগকে তিনভাগে ভাগ করেছে। একঃ হিস্টিরিয়া, দুই ঃ স্কিটসোফ্রেনিয়া, তিনঃ ম্যানিয়াকডিপ্রেসিভ।" (২৩)

কুসংস্কার বা লোকবিশ্বাস দীর্ঘকাল ধরে স্থায়ীভাবে টিকে থাকার ফলে সমাজের বিভিন্নস্তরে তা সুদৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয়েছে। কুসংস্কারের ফলে শত শত জীবন ও পরিবার শ্মশানে পরিণত হচ্ছে; আজও ওঝা বা হাতুড়ের হাতে অনেকে প্রাণ হারায়, ডাইনী সন্দেহে ছেলের হাতে বাবা, মা খুন হচ্ছে; অথচ ডাইনী বলে যাকে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে লাঞ্ছিত করা হয়, সেই নারীর বুভুক্ষু অন্তরের হিসেব কেউ নেয় না। এই অলৌকিক ক্ষমতা যে মিথ্যা তা প্রচারে ও প্রকাশে আমরা নিশ্চুপ। ডাইনী সন্দেহে অত্যাচারিত বা নিহত নারী আসলে একজন আমাদেরই মত সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ। সে বাঁচতে চায়, হাসতে চায়, সমাজের সাথে মিশতে চায়— এসবের খবর আমরা তারাশঙ্করের লেখার মধ্যেই পাই।

আবার আত্মা, পরলোকতত্ত্ব, ভূত-প্রেত, ব্রহ্মদৈত্য, ইত্যাদি বিষয়ে বর্তমান যুক্তিবাদীগণ ভিন্নমত পোষণ করেন। আত্মাকে স্বীকার করে নিয়েছেন ভাববাদী দার্শনিকগণ, কিন্তু চার্বাক সম্প্রদায় আত্মাকে অস্বীকার করেছেন। তাঁরা মনে করেন, "কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য প্রমাণের প্রয়োজন। একান্ত বিশ্বাস-নির্ভর অনুমানের সাহায্যে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব নয়। অনুমান নির্ভর, একান্ত বিশ্বাস নির্ভর অমর-আত্মা, ইহলোক, পরলোক ইত্যাদি ধারণাগুলো লোক ঠকানোর জন্য একদল ধূর্ত লোকের সৃষ্টি।" (২৪) এই সব ধূর্ত সম্প্রদায়ের বিচিত্র লীলা রহস্য তারাশঙ্কর বিভিন্ন গল্পে তুলে ধরেছেন। লাভপুর গ্রামটি ছিল সংস্কার ও কুসংস্কারে পূর্ণ। যেমন লাভপুরের দক্ষিণ পাড়ার শেষ প্রান্তে বিশাল অর্জুন গাছটিকে দেবতা বলে মনে করা হত। বর্তমানে অশুভস্থান বলে পরিত্যক্ত। এখানে আগে স্থানীয় মানুষেরা এই গাছটার নীচে নবজাতকদের দীর্ঘায়ু কামনার উদ্দেশ্যে সদ্যোজাত শিশুর নাভিকুন্ডলী পুঁতে রাখতেন। এখন আর গাছটি নেই— কেটে ফেলা হয়েছে। লাভপুরের পাশের গ্রাম বকুলগাঁয়ের পাশে মহানাগের মাঠ। প্রবাদ আছে যে এই মাঠে অশ্বত্থামার ব্রহ্মশিরবাণ কৃষ্ণের আদেশে গতি সম্বরণ করে শ্যামকুন্ড নামক মাঠে এসে সাপের রূপ নিয়ে ধরাশায়ী হয়। এখানকার অশ্বত্থগাছটাকে বোধিদ্রুমের সগোত্র ও পবিত্র বলে ধরা হয়। এসব প্রবাদ তারাশঙ্কর ধরে রেখেছেন "কালান্তর" উপন্যাসে। লাভপুরের পাঁচ মাইল দূরে সাউগ্রামে শিবালয়ে পুত্রহীনা মায়েরা সন্তান কামনায় মাদুলী নিয়ে থাকে যার পরিচয় 'গণদেবতা'য় আছে। 'ভুবনপুরের হাট"-এ বহু ধর্মীয় সংস্কার ও কুসংস্কার ছড়িয়ে আছে। বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং বীরভূম সংলগ্ন বর্ধমানের কাটোয়া দাঁইহাট-সালার প্রভৃতি অঞ্চলের লোক-জীবনে আজও যা প্রচলিত তা তারাশঙ্কর উল্লেখ করেছেন। সালারের হাট সম্পর্কে আদিত্য মুখোপাধ্যায় বলেছেন, "সালারের হাটে ক্রয় বিক্রয়ের সঙ্গে বিশেষ রোগ দেওয়া-নেওয়া হতো, এমন প্রবাদ আছে। ভুবনপুরে "ভুবনেশ্বর শিব" বিরাজ করেন। এখানকার হাটে মা গন্ধেশ্বরীর (দুর্গা) আটন। তাঁদের বরে এই হাটে অবিক্রিত কিছু থাকবে না। এমন কী সুখ-দুঃখও বেচাকেনা হয়। ভুবনেশ্বর শিবমন্দিরের পাশে প্রাচীন বটগাছের ডালে বা ঝুড়িতে লোকে শিবের উদ্দেশ্যে মনস্কামনা জানিয়ে ঢেলা বাঁধে। "রাধা" উপন্যাসে শ্যামরূপার গড় (ইচ্ছাই ঘোষের ঢেকুরগড়) এও মায়ের থানে ঢেলা বাঁধার রীতি আছে। (২৫) গুণীন বা যাদুকর গাছ চালিয়ে গাছের উপর চেপে রাতের অন্ধকারে একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাত্রা করত। সূর্য উঠলেই সাধারণের মাঝে গোপন রাখার জন্যে গাছ সেখানেই থামিয়ে রাখত। এই সমস্ত গুণীন বা ওস্তাদরা কামাক্ষ্যা মায়ের মন্দিরে গিয়ে এইসব অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা ও ভেল্কীবাজী শিখে আসত—এই প্রবাদ সমগ্র রাঢ়ের পল্লীজীবনে আজও ছড়িয়ে রয়েছে। বহু দেবদেবীর পীঠস্থান এই বীরভূম। এর ফলে এখানে বহু সংস্কার-বিশ্বাস-কুসংস্কার সমানভাবে আজও বর্তমান।

এবার তারাশঙ্করের লেখা গল্পগুলির দিকে দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে—

"একটি যাদুকরের মৃত্যু" ঃ- বাণমারা, যাদুবিদ্যা প্রয়োগ, তন্ত্রমন্ত্রের দ্বারা মানুষের ক্ষতি করা যাদের স্বভাব, যারা

চিরকাল আদিম সংস্কার বুকে নিয়ে বেঁচে থাকে— তাদের নিয়ে রচিত এই গল্পটি। প্রৌঢ় যাদুকর খোঁড়া নাদের শেখ কাউরের বিদ্যায় বিশ্বাসী, বাণ মেরে মানুষের সর্বনাশ করে, আবার মন্ত্রের দ্বারা ঝাড়ফুঁক করে সাপের বিষ নামায়। তার বান্ধবী এক বেদেনী, সেও যাদুকরী। এই যাদুবিদ্যা অতি প্রাচীন। যাদুবিদ্যা সম্পর্কে রোলো আহমেদ বলেছেন, "Magic was man's first effort to establish contact with the unknown, the hidden spiritual forces, which hedimly felt to exist and by means of which he hoped to attain his desires and accomplish matters that proved difficult or too much for him by ordinary means."(২৬)

একদিন এক ডাক্তারবাবুর সামনে সেই বেদেনীর সঙ্গে নাদের মন্ত্রের ভেল্কী দেখাচ্ছিল। হঠাৎ স্থানীয় জমিদার মহাদেববাবু এসে নিজের ছেলেকে বাণমারার অভিযোগে বেদেনীকে পাদুকা প্রহারে জর্জরিত ও অপমানিত করে চলে যান। বান্ধবীর উপর জমিদারের এই অন্যায় ও নির্মম ব্যবহারের প্রতিশোধ নিতে নাদের মরিয়া হয়ে ওঠে কারণ বান্ধবীকে সে-ই খেলা দেখাতে ডেকে এনেছিল। তাই নাদের জমিদারের পুত্রের মৃত্যুর জন্যে গুরুর কাছে শেখা শ্রেষ্ঠ বিদ্যা 'বাণ" নামক মারণাস্ত্র ব্যবহার করতে উদ্যত হয়। রাত্রের অন্ধকারে অস্ত্র তৈরী করতে শুরু করে। অস্ত্র প্রস্তুত হবার প্রাক্কালে নাদেরের মন দ্বিধাগ্রস্ত হল কারণ তার মনে পড়ে যায় গুরুর শেষ নিষেধবাণী— "এ বিদ্যা তুমি কখনও মানুষের উপর হানবে না।" নাদের সভয়ে পিছিয়ে আসে। অস্ত্র প্রয়োগ না করে তাড়াতাড়ি মাটিতে পুঁতে ফেলে। তার শরীর দুর্বল হয়। দিন তিনেক বাদে নাদের সেই ডাক্তারের কাছে এসে বলে, "এমন কি ওষুধ আছে বাবু, যাতে যা শিখেছি সব ভুলে যাই।" নাদেরকে দেখে যেন মনে হল তার দেহমনের উপর দিয়ে যেন এক প্রচন্ড ঝড় বয়ে যাচ্ছে। ডাক্তারবাবু তাকে মিক্সচার খাইয়ে ঐ সব উদ্ভট চিন্তা করতে নিষেধ করেন। সেই দিনই সন্ধ্যেয় ডাক্তারবাবুর সাথে নাদেরের দেখা হলে নাদের হতাশার সুরে বলে, "আমার আর কি রইল বাবু। সব যে হারিয়ে গেল।" অর্থাৎ তুকতাক, বাণমারা, ডাইনী ইত্যাদি প্রাগৈতিহাসিক যুগের যে শেষ হতে চলেছে, আগমন ঘটতে চলেছে নব বিজ্ঞানের—তারই ইঙ্গিত লেখক দিয়েছেন। জগদীশ ভট্টাচার্য বলেছেন, "নাদেরের এই আর্তনাদ প্রাগৈতিহাসিক মানুষের অন্তিম দীর্ঘশ্বাসের মতোই সভ্য মানুষদের সমাজদেহে আছড়ে পড়েছে।"(২৭) দীর্ঘদিনের অভ্যাস নাদেরের রক্তে মিশে গেছে। তাই শত চেষ্টা করেও সে ভুলতে পারছে না, এবং ভোলবার চেষ্টাও করেছে না। কারণ সে ভাবে এসব ভুলে গেলে যে তার মান, ইজ্জৎ সব লীন হয়ে যাবে। এখানে যাদুবিদ্যা বা মন্ত্রতন্ত্র যে সব মিথ্যে তা প্রতিপন্ন করেছেন ডাক্তার। কারণ যেদিন বেদেনী একমুঠো ধুলো মন্ত্রের সঙ্গে নাদেরকে মারে সেদিন বেশ কয়েকটা মৌমাছি নাদেরকে কামড়ে দেয়। কিন্তু ডাক্তারবাবু ব্যাপারটা ধরে ফেলেন। তাঁর বাড়ীর কোনে মৌচাক ছিল সেখান থেকেই বেদেনী মৌমাছি ধরে এনেছিল। নাদেরও স্বীকার করে যে এমন একটা গাছ আছে যে তার রস হাতে মাখলে মৌমাছি বা বোলতা কামড়ায় না। ডাক্তার তখন বলেন যে মন্ত্রতন্ত্র সব মিথ্যে, কেবল গাছের রসই সত্য। সাপ ধরায় কেবল হাতের কসরত আর সাহসই প্রয়োজন, মন্ত্রের নয়। বর্তমান যুগে ওসব কুসংস্কার ব্যতীত অন্য কিছু যে নয় তা ডাক্তারবাবু প্রতিপন্ন করেছেন। এই মনোভাব ছিল প্রগতিবাদী লেখকেরও। কয়েকটি গল্প দেখা যাক—

শ্যামাদাসের মৃত্যু ঃ- এখানে একদিকে বিজ্ঞানবুদ্ধি, অন্যদিকে ধর্মীয় সংস্কারের দ্বন্দ্ব। অধ্যাপক শ্যামাদাসের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা স্ত্রী কৃষ্ণভামিনীর বিশ্বাসমূল সংস্কারের কাছে পরাজিত হয়েছে। কৃষ্ণভামিনী ছিলেন ধর্ম, অধর্ম, পাপ-পূণ্য, মায়া-মোহের এমনকি জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। তাই মৃত্যুর সময় পরপারে যাবার সময় তিনি বলেছিলেন যে তাঁকে তাঁর পিতামাতার বিদেহী আত্মা নিতে এসেছেন। তিনি আরও বলেছিলেন, "ভুল বকিনি আমি। আমিও আসব তোমাকে নিতে। দেখো তুমি, ঠিক আসব।" শ্যামাদাস তা বিশ্বাস করেন নি, কারণ তাঁর যাত্রা ছিল ভিন্ন পথে। জন্ম-মৃত্যু বিজ্ঞানের শাশ্বত নিয়মেই ঘটে। তিনি মৃত্যুর সময় স্ত্রীর বিদেহী আত্মা দেখতে পাননি বটে, কিন্তু অন্য এক গভীরতম রহস্যের সন্ধান পান। দেহের কোষ চক্রের দ্রুত পরিবর্তন, জীবদেহে ক্রমশঃ মৃত্যুর অধিকার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি উপলব্ধি করেছিলেন। মৃত্যুর সময় দুহাতের তালুতে তাঁর দুফোঁটা অশ্রুপাত হয়তো কৃষ্ণভামিনীর বিশ্বাসের কাছে আত্মসমর্পণ করার ইঙ্গিত বহন করে। মৃত্যুর প্রাক-মুহূর্তে অতিবড় নাস্তিকেরও যে স্মৃতিভ্রম ঘটে যায় তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই গল্পটি।

রাজসাপ ঃ- মানবমনের আদিম সংস্কারকে অবলম্বন করে বস্তু-মুখ্য এই গল্পটি। কুসংস্কারকে অবলম্বন করে কি মর্মান্তিক Tragedy সৃষ্টি হয়েছে তারই বর্ণনা আছে। "সিগমুন্ড ফ্রয়েড তাঁর "টেটেম অ্যান্ড ট্যাবু" গ্রন্থে বলেছেন, "আদিম মানব এখনো আমাদের সহযাত্রী। অর্থাৎ আমরা যতই সভ্যতাভিমানী হই না কেন, আদিম কুসংস্কারগুলি এখনো আমাদের মনের অন্ধকার প্রদেশে লুকিয়ে আছে।" (২৮) ভবেশ দরিদ্র, অনেকগুলো সন্তান ও বৃদ্ধা মাকে নিয়ে সংসার চালাতে হিমসিম খাচ্ছে, অথচ তার মুনিব নিশাকর হঠাৎ ধনী হয়ে ওঠে। ভবেশ জানতে পেরেছে যে নিশাকরের গৃহে রাজসাপ আছে এবং এ সাপ থাকলে বাড়ীর কর্তা ধনী হবেই। বন্যায় ঘর ভেঙ্গে গেলে ভবেশ নিশাকরের একটি ঘরে আশ্রয় নেয়। সেখানেই ভবেশ নিশাকরের সৌভাগ্যসূচক রাজসাপটিকে দেখতে পেয়ে হাঁড়িতে বন্দী করে নিজের ঘরে গোপনে এনে রাখে আর স্বপ্ন দেখে বিশাল সম্পদের। মৃত্যুশয্যা-শায়িনী মায়ের বরাদ্দ দুধটুকু বঞ্চিত করে ভবেশ সাপটিকে খেতে

দেয়। একদিন ক্ষুধার জ্বালায় বৃদ্ধা সাপটির ঘরে ঢুকে অজান্তে বিষাক্ত দুধ পান করে মারা যায়। এদিকে অর্থের কোন আশা না পেয়ে ভবেশ হতাশ হয়ে পাঁচ টাকায় সাপটাকে বিক্রি করে মায়ের শ্রাদ্ধ-শান্তি করে। অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল বলেই ভবেশ মাকে হারিয়েছে। বাড়ীতে সাপ থাকলে ধনী হওয়া যায় না— এই সত্যটি ভবেশ বোঝে নি, বোঝে নি বলেই মায়ের জন্যে সামান্য দুধ মাকে না দিয়ে সাপকে দিয়েছে, এমন কি সাপের মোহে মোহান্ধ হয়ে মায়ের মৃত্যু কামনা করেছে। এইভাবে পল্লীবাংলার ঘরে ঘরে আজও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনোভাবের জন্যে অশান্তির আগুন জ্বলছে।

ডাইনী ঃ- অলৌকিক বিশ্বাস, কুসংস্কার ও কিংবদন্তী মানুষের জীবনে কত ভয়াবহ হয়ে আত্মপ্রকাশ করতে পারে তারই চরমতম নিদর্শন এই গল্পটি। বস্তুত: যাদুবিদ্যা চর্চা করতে গিয়ে এই ডাইনী-তন্ত্রের সৃষ্টি হয়। যাদুবিদ্যাকে যতটা কুপথে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ডাইনীতন্ত্রে তার প্রমাণ আছে। **"ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ডাইনীর যে চেহারা মানুষের মনে অঙ্কিত হয়েছিল তা হল একটি কুরূপা বৃদ্ধা নির্জন কুটিরে বসে নানা রকম ওষুধ-পত্র তৈরী করছে, তার পাশেই ঘুর ঘুর করছে একটি বেড়াল।"** (২৯) ডাইনীতন্ত্র বস্তুজগৎকে বশে রাখতে এমন অপকর্ম নেই যা সে করেনি। শেক্সপীয়ারের "ম্যাকবেথ" নাটকে ডাইনী চরিত্রের সন্ধান মেলে।

আমাদের দেশে ডাইনী-তন্ত্র কবে সুসংহত রূপ পরিগ্রহ করেছিল তার সঠিক দিনক্ষন জানা যায় না। তবে "ডাকিনী-যোগিনীর" নাম বিভিন্ন সাহিত্যে পাওয়া যায়। মেয়েরা পারস্পরিক ঝগড়ার সময় "ডাইনী" বলে গালাগালি দেয়। তবে ডাইনী সম্বন্ধে ড: আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন, **"ডাইনীবিদ্যা সম্বন্ধে প্রথম কথা এই যে, ইহা 'গুরুর' নিকট হইতে শিক্ষা করিতে হয়, গুরুর শিক্ষা ব্যতীত কিছুই হয় না। কতকগুলি বিশেষ দৈহিক লক্ষণযুক্ত নারী সহজেই ডাইনী বিদ্যা শিখিতে পারে, "গুরু" যাহাকে এই বিদ্যায় দীক্ষাদানের সংকল্প করেন, কেবলমাত্র সেই এই বিদ্যার অধিকারী হইতে পারে।"** (৩০) অত:পর ড: ভট্টাচার্য শরৎচন্দ্র রায় মশাইয়ের উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়েছেন, **"ওঁরাওদের মধ্যে ডাইনীতন্ত্রের প্রচলন আছে। সাঁওতালদের মধ্যেও এ-তন্ত্রের ব্যাপক চর্চা হয় বলেছেন।"** (৩১) ধ্বংসাত্মক যাদুবিদ্যার একটি দিক হল ডাইনীবিদ্যা। উপজাতীয় অঞ্চলে ব্যর্থতা, দুর্ভাগ্য এবং মৃত্যু ইত্যাদির ব্যাখ্যা স্বরূপ ডাইনীবিদ্যাকে দায়ী করা হয়। ডাইনী বিদ্যা গ্রহণে মেয়েদের বেশী উৎসাহী হতে দেখা যায়। রেভারেন্ড পি.ও.বক্তি ট্যাবু কাস্টমস্ অ্যামাং দি সানতালস্" গ্রন্থে বলেছেন, **" মেয়েরা সে ভাল বা মন্দ উদ্দেশ্যেই হোক, অলৌকিক ক্ষমতাগুলোর কাছে পৌঁছুতে চায়। সেটা প্রকাশ্যে পারেনা। কারণ পুরুষেরা মত দেয় না। তাই গোপনে ডাইনী বিদ্যার অনুশীলন করে।"** (৩২)

বর্তমান ভারতবর্ষে আজও এই ডাইনী বিষয়ক কুসংস্কার আদিবাসী সমাজে সক্রিয় ক্রিয়াশীল। রাঢ় বাংলার সমাজে এই কুসংস্কার প্রচলিত। এককালে গ্রামীণ মনে ডাইনীতে দৃঢ় বিশ্বাস। যাকে ডাইনী বলে অপবাদ দেওয়া হয় তার জীবনে নেমে আসে নিদারুন যন্ত্রনা। পারিপার্শ্বিক চাপে সে নিজেকে ডাইনী বলে বিশ্বাস করতে থাকে। বীরভূমের ছাতিফাটা মাঠ নিয়ে নানা প্রবাদ প্রচলিত আছে। সেই সব প্রবাদকে উপাদান করে তারাশঙ্কর গল্প লেখেন। "ডাইনী" ও "ডাইনীর বাঁশি" অন্যতম। অলৌকিক বিশ্বাস ও কুসংস্কারে বিশ্বাস করে সহজ সরল দুই নারীর জীবনে কী ভয়াবহ ট্যাজেডি নেমে এসেছে তার সার্থক রূপায়ণ গল্প দুটিতে। "ডাইনী" গল্পটি সম্পর্কে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, **"কুসংস্কারের ভিত্তিতে একটি গ্রামের মেয়ের দুর্ভাগ্যের ইতিবৃত্ত এতে বর্ণনা করা হয়েছে; কিন্তু অদ্ভুত বলিষ্ঠতায় অনুভূতির তীক্ষ্মতায় আর পরিবেশের রুদ্রতায় সমস্ত গল্পটিতে যেন অতিলৌকিক পরিবেশ গড়ে উঠেছে।"** (৩৩) ছাতিফাটা মাঠের পূর্বপ্রান্তে এক আমবাগানে দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে বৃদ্ধা সুরোধনী-ডাইনী বাস করে। বৃদ্ধার বাড়ি এখানে নয়, কোথায় কেউ তা ঠিক জানে না। **"তবে একথা নাকি নিঃসন্দেহ যে, তিন চারখানা গ্রাম একরূপ ধ্বংস করিয়া অবশেষে একদা আকাশপথে একটা গাছকে চালাইয়া লইয়া যাইতে যাইতে এই ছাতিফাটা মাঠের নির্জন রূপে মুগ্ধ হইয়া নামিয়া আসিয়া এইখানে ঘর বাঁধিয়াছে।"** (৩৪) সুরোর বয়স যখন দশ-এগার বছর তখন হারু বামুনের ছেলের পেট ব্যথা শুরু হলে হারু বামুনই এই মেয়েটির বিরুদ্ধে ডাইনীর অভিযোগ আনে। সেই থেকেই সে হয় ডাইনী। ফলে ডাইনীর মানুষীসত্তার মৃত্যু ঘটে; আত্মপ্রত্যয় নষ্ট হয়। সেও নিজেকে ডাইনী ভাবতে শুরু বরে। মানুষ দেখলেই তার অনিষ্টস্পৃহা জেগে ওঠে। নরুণ দিয়ে চেরা ছুরির মত চোখ, বিড়ালের মত দৃষ্টি দিয়ে যাকে তার ভাল লাগে তাকে সে আর ছাড়ে না। সে যেন মানুষের দেহরস, লোলুপা রাক্ষসী। মানুষের নিত্য সন্দেহ, ঘৃণা, বিদ্বেষ, লাঞ্ছনায় দগ্ধ হয়েছে তার মানবী-সত্তা। সে মানুষ হতে চায়, ভালবাসা পেতে চায়, মিশতে চায় সমাজের সাথে, অথচ সে পারে না। তাই সে পাষাণ দেবতার কাছে প্রার্থনা জানায়— "মা আমাকে ডাইনী হইতে মানুষ করিয়া দাও, আমি তোমাকে বুক চিরিয়া রক্ত দিব"। হঠাৎ রটে যায় যে বাউরীদের ছেলেকে সে বাণ মেরেছে। গুনীন এসেও ছেলেটাকে বাঁচাতে পারে না। ছেলেটার ধনুষ্টংকার হয়েছিল অথচ এ-রোগের খবর অন্ত্যজ বাউরী সমাজ জানতো না। সকলের রাগ গিয়ে পড়ে ডাইনী সুরোধনীর উপর। সেই রাতেই সুরোধনী মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচতে পালাতে চায়, কারণ সকালে বাউরীর দল এসে তাকে খুন করতে পারে— এইভেবে সে তার শেষ সম্বল ছোট্ট একটা পুঁটলী নিয়ে ছাতিফাটার মাঠে নামে। শুরু হয় কালবৈশাখী। পরিদিন সকালে গ্রামবাসী দেখে এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য— "একটা কাঁটা ডালের সূচালো ডগায়...... তীক্ষ্মাগ্র প্রান্তে বিদ্ধ হইয়া ঝুলিতেছে বৃদ্ধা ডাকিনী"।

গ্রামীণ মানুষের অলৌকিক বিশ্বাস এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন হওয়ার ফলে এক সরল গ্রাম্য বালিকার জীবনে কী ভয়াবহ দুর্ভাগ্য নেমে এসেছে তারই বর্ণনা দিয়েছেন তারাশঙ্কর। "তারাশঙ্করের গল্পে জীবন ও প্রকৃতি" প্রবন্ধে দীপক চন্দ্র বলেছেন, "গ্রামীণ মানুষের অলৌকিক বিশ্বাস এবং কুসংস্কারের সঙ্গে একটি সরল গ্রাম্য বালার দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা সংযুক্ত করে যে অবর্ণনীয় দুর্ভাগ্যের সৃষ্টি হল তা ছাতিফাটা মাঠের 'তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া মানুষের মৃত্যু হওয়ার মত।" নিসর্গকে মানবায়িত করার এই শৈল্পিক সার্থকতা গল্পের পরিসমাপ্তিতে শোচনীয় ট্র্যাজেডির বীজ রোপণ করে।" [৩৫]

ডাইনীর বাঁশি ঃ- তারাশঙ্করের এটি নিজের চোখে দেখা এবং নিজগ্রামের স্বর্ণ বেনের জীবনের একটি সত্যকার ঘটনা। তিনি তাঁর "সাহিত্য জীবন" গ্রন্থে বলেছেন, "আমাদের গ্রামে ছিল গন্ধবণিকদের মেয়ে নিঃসন্তান বিধবা স্বর্ণ; লোকে বলত সে ডাইনী। সনা ডাইনী। আমাদেরই বৈঠকখানা বাড়ির সংলগ্ন পুকুরের উত্তর-পূর্বকোণে একটি অশ্বত্থতলায় ছিল তার বাড়ি।" [৩৬] স্বর্ণ ডাইনীর নিখুঁত বর্ননা তিনি তাঁর "স্মৃতিকথায়" লিখেছেন, "ডাইনী ছিল..........। স্বর্ণ ডাইনীকে মনে পড়ছে। শুকনো কাঠির মত চেহারা, একটু কুঁজো, মাথায় কাঁচা পাকা চুল। হাটে তরি তরকারী কিনে গ্রামে, ঘরে বেঁচে বেড়াত। চোখ দুটো ছিল নরুণে-চেরা চোখের মত ছোট।....... তার শেষ কালটায় আমি বুঝেছিলাম তার বেদনা। মর্মান্তিক বেদনা ছিল তার। নিজেরও তার বিশ্বাস ছিল, সে ডাইনী। কাউকে স্নেহ করে সে মনে মনে শিউরে উঠতো। কাউকে দেখে চোখে ভাল লাগলে সে সভয়ে চোখ বন্ধ করতো।....... সমগ্র পৃথিবীতে তার আত্মীয় ছিল না। রোগের যন্ত্রনায় দুঃখে সমগ্র জীবনটাই সে একা কাটিয়ে গেছে"। [৩৭] এই ডাইনী গল্প দুটি প্রকাশের পর অনেকেই তারাশঙ্করকে ইউরোপের উইচক্র্যাফ্‌ট সম্বন্ধীয় গল্পের অনুকরণ বলে সমালোচনা করেন। কিন্তু এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যে। লেখকের নিজের চোখে দেখা এগুলি। এই অভিযোগের বিরুদ্ধে স্বয়ং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, " আমাদের দেশের ডাইনী এঁরা (অভিযোগকারী) দেখেন নি, জানেন না, বিশ্বাস করেন না। আমি তাই তাঁদের বললুম; উঁহু উঁহু। এ তারাশঙ্করের চোখে দেখা। আমি যে নিজে দেখতে পাচ্ছি গ্রীষ্মকালের দুপুরে তালগাছের মাথায় বসে চিলটা লম্বা ডাক ডাকছে, গলাটা তার ধুক ধুক করছে। আর নিজের ঘরের দাওয়ায় বাঁশের খুঁটিতে ঠেস দিয়ে স্বর্ণ ডাইনী বসে আছে আচ্ছন্নের মতো। আমি চোখে দেখতে পাচ্ছি"। [৩৮]

ডাইনী গল্পের নায়িকা স্বর্ণ। তার মা 'ডাইনী' বলে পরিচিতা ছিল। তাই অনেকের ধারণা স্বর্ণের প্রতি তার মায়ের দৃষ্টি পড়েছে। তাই স্বর্ণও ডাইনী, অথচ সে নিঃসহায়, তরিতরকারি বেচে দিন কাটায়। সে পাড়ার ছোটছেলে টুকুকে ভালবাসে, টুকুও স্বর্ণকে কনে বলে ডাকে। একদিন মুখুজ্জে বাড়ির গর্ভবতী বৌ অসুস্থ হলে, বাড়ির গিন্নী স্বর্ণর নামে অপবাদ দেয়। এদিকে টুকু স্বর্ণের কাছে বাঁশি চেয়ে বাড়িতে এসে প্রবল জ্বরে পড়ে; জ্বরের ঘোরে সে বিকারে স্বর্ণর নাম ধরে বলতে থাকে "আমায় ছেড়ে দে, ছেড়ে দে কনে।" স্বর্ণ সেই কথা আড়াল থেকে শোনে এবং নিজেকে ডাইনী ভাবতে শুরু করে। এদিকে মুখুজ্জে বৌ মৃত-সন্তান প্রসব করে মারা যায়। স্বর্ণ বিছানায় শুয়ে কাঁদতে থাকে, সর্বাঙ্গে তার ব্যথা; সে তার মৃতা মাকে অভিসম্পাত দেয়। গুণীনের ঝাড় ফোঁকে টুকু সুস্থ হয়। স্বর্ণ টুকুর জন্যে বাঁশি নিয়ে টুকুর বাড়িতে গিয়েও তার হাতে দিতে সাহস পায় না; পাছে কেউ দেখে অশান্তি করে অথচ বাঁশি টুকুকে দিতেই হবে, তাই স্বর্ণ বাঁশিটি টুকুর খেলাঘরের পাশেই রেখে চলে যায়। স্বর্ণ বাড়ি এসে বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে থাকে; কিছুক্ষণ পর সে টুকুর বাঁশির আওয়াজ শুনতে পায়। এখানে স্বর্ণের নিখাদ বাৎসল্য ও ডাইনী-বিশ্বাস বড় হয়েছে। লোক বিশ্বাস ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন মানুষ এ ভাবে কত শান্ত, সরল মেয়েদের ডাইনী সাজিয়েছে। এতটুকু মায়া, মমতা, বা করুণা করেন নি তারা। তারাশঙ্কর ডাইনীদের বাস্তব জীবনালেখ্য তুলে ধরলেও তাদের জীবনে মানবীয় সত্তার দিকটাও অঙ্কন করেছেন।

আজ শিক্ষিত সমাজ ডাইনীতন্ত্রের ও ডাইনী হত্যার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। তারাশঙ্কর এর অনেক আগেই ডাইনী বিশ্বাস ও কুসংস্কারকে তুলে ধরেছেন ও ডাইনী অপবাদে জর্জরিতা নিরীহ নারীজাতির অন্তরের বুভুক্ষা ও বিবিক্ত জীবনের দিকটাও সুন্দরভাবে সমাজের কাছে তুলে ধরেছিলেন— এইখানেই তারাশঙ্করের নতুনত্ব।

আবার গ্রামে স্কুল, হাট, ডাক্তারখানা করতে নেই, লক্ষ্মীর সাথে সরস্বতীর একসাথে সাধনা করা যাবে না, কারণ লক্ষ্মী সরস্বতী উভয়ে সতীন; দুজনের মিল নেই— এই বিশ্বাসের বশীভূত হয়ে গ্রামে স্কুল তৈরী করতে চায় নি কেউ। গ্রামে ইট তৈরী করা চলবে না, সরকার থেকে ইঁদারা তৈরী হলেও পেটে নোনা ধরার ভয়ে সেই জল স্পর্শ করেনা, কয়লা পোড়াতে নেই, কেবলমাত্র পানসাজার জন্যে ছাড়া কখনও চুন ব্যবহার করা চলবে না, শেয়াল ছাগল ধরে নিয়ে গেলেও তাকে তাড়ানো যাবে না কারণ শেয়াল নাকি সাক্ষাৎ ভগবতী। এরকম নানা কুসংস্কারে বিশ্বাসী রাঢ়ের বহু গ্রাম ছিল। এদের নিয়েও তারাশঙ্কর গল্প লিখেছেন। যেমন, নুটু মোক্তারের সওয়াল, ব্যাঘ্রচর্ম, প্রভৃতি। এগুলি সবই সামন্ত - সংস্কার। এই পর্যায়ে আর একটি গল্প ঃ-

বন্দিনী কমলা ঃ- অতিপ্রাকৃত বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত এই গল্প। রায়বাড়ির কমলা (লক্ষ্মী) কে বন্দিনী করে রাখার অতিপ্রাকৃত কাহিনী শতাব্দীব্যাপী সংস্কারে পরিণত হয়েছে। এই বংশের দেওয়ান গোপীবল্লভের সতীসাধ্বী বিধবা স্ত্রী

কোজাগরী লক্ষ্মীপূজোর রাত্রে লক্ষ্মীকে ঘরে বন্দিনী করে জলে ডুবে প্রাণ দেন। রাঢ়ের মাটিতে প্রবাদ ছড়িয়ে আছে যে কোজাগরী পূর্ণিমার রাতে মা লক্ষ্মী স্বয়ং মর্তে নেমে আসেন এবং এই রাতে প্রতিটি গৃহে তিনি আসেন; কেউ জেগে থাকলে লক্ষ্মী তাঁকে আশীর্বাদ করে যান। এই লোকসংস্কার আজও অনেকের কাছে জীবন্ত হয়ে আছে। বহু রমণী কোজাগরী পূর্ণিমার রাতে জেগে বসে থাকেন। এমনি এক কোজাগরী পূর্ণিমার রাতের তৃতীয় প্রহরে বাড়িতে বসতে চেয়ে এক পরমাসুন্দরী আসে। তখন গোপীবল্লভের স্ত্রী মেয়েটিকে ঘরে বসতে দিয়ে বাইরে থেকে শেকল তুলে তালা দিয়ে বড় ছেলেকে চাবি দিয়ে বলেন, " ও তালা তোমার বংশে কেউ যেন কখনও না খোলে। মা লক্ষ্মীকে আমি বন্দিনী করে চললাম।" (৯) এই বলে তিনি গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ দেন। কিন্তু পরবর্তী বংশধরদের অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে। তারা পূর্বপুরুষদের নিষেধ অমান্য করে অর্থের লোভে সেই ঘরটির তালা খোলে এবং পায় কেবল নরকঙ্কাল, একরাশি বিবর্ণ চুল আর নামাবলি। হয়তো বিপদাপন্ন হয়ে কোনো সরলা সুন্দরী রাতের শেষে একটু আশ্রয় খুঁজতে এসেছিল, কিন্তু সংস্কারের যূপকাষ্ঠে তাকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। সংস্কার এবং কিংবদন্তীই এখানে ক্রিয়াশীল।

আবার 'বোবা কান্না'য় ত্রিপুরা ভট্টাচার্যের আস্তিক্য বুদ্ধির সঙ্গে বিজ্ঞানী ডাক্তারের দ্বন্দ্ব, 'পুত্রেষ্টী' গল্পে পুত্র কামনায় পাগল জমিদার অপরের পুত্রকে বলি দিতে বদ্ধপরিকর, প্রাচীন সংস্কারের প্রতি বিদ্রোহী মনোভাব প্রকাশিত 'শিলাসন' গল্পে, দেশীয় সংস্কারের উপর আস্থাশীল হয়ে পিতা নিজ পুত্রের খ্যাতিতে ঈর্ষান্বিত হয়েছেন, 'পিতাপুত্র' গল্পে।

ছলনাময়ী ঃ- অর্থ, প্রতিপত্তি ও যশ কামনায় অতীন্দ্রিয় শক্তিকে বশীভূত করতে তান্ত্রিক-মার্গ অনুসরণ করেছেন কলিয়ারীর ম্যানেজারবাবু— তন্ত্রে বশীভূত হয়ে তিনি অমানুষে পর্যবসিত। স্ত্রীকে প্রহার, সংসারের প্রতি অবহেলা, একমাত্র কন্যার নিরীহ সদ্য-বিবাহিত জামাইকে তিনি হত্যা করিয়েছেন; শেষে উন্মাদ হয়ে গেছেন। এখানেও অন্ধ কুসংস্কার বলবত্তর হয়েছে।

সংসার ঃ- সংসার বড় কঠিন পরীক্ষাগার। কবে কোন অতীতে মানুষ বিধান রচনা করেছিল যে, কোন ব্যক্তির দীর্ঘ বারো বছর যদি কোন সন্ধান বা খোঁজ পাওয়া না যায়, তাহলে তার বিধিসম্মত শ্রাদ্ধ শান্তি করতে হবে। আবার শ্রাদ্ধ-শান্তির পর যদি ঐ ব্যক্তি বাড়ী ফিরে আসে তাহলে বাড়ীতে তার আর স্থান হবে না; কারণ সে তখন প্রেতাত্মা— এতে সংসারের অমঙ্গল হবে। এই কুসংস্কারে বশীভূত হয়ে সরকারকর্তাকে ঘরে স্থান দেয় না তাদের পুত্রগণ। সরকারকর্তা ও গিন্নী মহাকুম্ভে স্নান করতে গিয়ে কলেরায় আক্রান্ত হ'ন। পুত্রগণ পিতামাতার দীর্ঘদিন কোন সংবাদ না পেয়ে সমাজপতিদের বিধান অনুযায়ী শ্রাদ্ধ-শান্তি করে ফেলে। এদিকে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে স্ত্রী মারা গেলেও বৃদ্ধ সরকার মারা যান নি। তিনি বাড়ীতে ফিরে আসেন, কিন্তু অন্ধকুসংস্কারে অন্ধ হয়ে পুত্রগণ জীবিত বাবার সম্পদ ভোগ করলেও সামান্য কর্তব্য পালন করে নি— বাবার জন্যে গঙ্গার তীরে ঘর তৈরি করে সেখানে বাবার থাকার ব্যবস্থা করে। অন্ধ বিশ্বাসের কাছে পিতা-মাতাও যে কত তুচ্ছ হয়ে যায় তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত 'সংসার' গল্পটি।

প্রতিমা ঃ- সামন্ত-সংস্কারের ভয়ে নির্মল চরিত্রের যমুনা আত্মহত্যা করেছে। চরিত্রহীন, মাতাল, ছোটজমিদার বাবু ফুলশয্যার দিনেই স্ত্রীকে প্রহার করেছে। বিবাহিতা জীবনে যমুনা শান্তি পায়নি— একটি ঘরে বন্দিনীর মত জীবন যাপন করেছে। তার অব্যক্ত বেদনা, দুঃখ, কষ্ট সব উপলব্ধি করেছিল জমিদার বাড়ির পুরুষ পরম্পরায় মৃৎশিল্পী কারিগর কুমারিশ। তার কেমন যেন একটা মমতা জাগে যমুনার প্রতি। দুর্গা প্রতিমা তৈরি করেছে কুমারিশ। কিন্তু এ কি? মূর্তির মুখাবয়ব ঠিক যেন যমুনার মত। যমুনা মূর্তি দেখে তার পরিণাম ভেবে শিউরে ওঠে এবং উপায়ান্তর না দেখে পাশের খিড়কিতে ডুবে প্রাণ দিয়েছে। সকলে যমুনাকে নিয়ে কুমারিশের অবৈধ সম্পর্কের কথা বলবে যার ফল হবে মারাত্মক যা তদানীন্তন সামন্ত পরিবারে অহরহ ঘটত। অর্থাৎ সামন্ত পরিবারের পুরুষেরা ব্যভিচারী জীবন যাপন করেছে; মেয়েদের কেবল অবিচার, অত্যাচার করেছে। প্রতিমার মূর্তি মানুষের কল্পনার সৃষ্টি। এই সৃষ্টির জন্যে কারিগর এই পৃথিবীর যে কোন সুন্দর মানুষেরই হুবহু নকল করে । তাছাড়া কুমারিশের হৃদয়ে এক দুঃখিনী মেয়ের প্রতি স্নেহের উদয় হয়েছিল। তারই প্রতিফলন মূর্তিতে ঘটে। কিন্তু সামন্ত-রক্ত এই সত্যকে উপলব্ধি কোনদিনই করে নি। খুঁত দেখলেই স্ত্রীকে ত্যাগ করাই তাঁদের ধর্ম। এই স্বার্থান্বেষী সংস্কারের পায়ে বলি হয়েছে যমুনা।

অগ্রদানী ঃ- এই গল্পটি লোক বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল। হিন্দু সমাজে মৃতদেহের আত্মার মুক্তির জন্যে পিন্ডদান প্রচলিত। পিন্ড গ্রহণকারী ব্রাহ্মণ সমাজে নিম্ন স্থানীয় বলে গণ্য হন। তাই পিন্ড গ্রহণ করতে সহজে কোন ব্রাহ্মণ রাজী হতেন না। অর্থদানে বশীভূত করেই তাকে অনুপ্রাণিত করা হত। সামন্তদের খেয়াল খুশিমত অর্থ, জমির প্রলোভন দেখিয়ে অসংখ্য পূর্ণ চক্রবর্তীদের বাধ্য করে পিন্ড গ্রহণকারী সাজিয়েছে— তাদের মনুষ্যত্ব ধ্বংস করেছে বহু সামন্ত-জমিদার।

ভুলোর ছলনা ঃ- 'ভোলা' নামে এক অপদেবতা ভর করলে নাকি মানুষ সব ভুলে যায় অর্থাৎ বিভ্রান্ত ও আত্মবিস্মৃত হয়—এটাই লোকসমাজে প্রচলিত বিশ্বাস। 'ভোলায়' ধরলে রোগী অনেকটা বোবার মত হয়ে যায়। ভোলা

তাকে যেমন খুশি পরিচালনা করে। সুস্থ মানুষকে হঠাৎ ভোলায় ধরলে সে উল্টোপাল্টা দিকে চলে যায়। সে হয়তো পূর্ব দিকে যেতে চাইছে, কিছুক্ষণ হাঁটার পর সে দেখল সে পৌঁছে গেছে পশ্চিমদিকে। কিংবা কিছুই সে মনে করতে পারে না, হাবার মত দাঁড়িয়ে থাকে, হয়তো কথাও বন্ধ হয়ে যায়। 'ভোলা' তাকে শুধু ভুল করাতে থাকে। "অনেক জায়গায় এর চিকিৎসা হিসেবে 'ভোলা'য় ধরা ব্যক্তিকে সর্বসমক্ষে হাজির করানো হয়। তারপর গুণীন কিছু মন্ত্র পড়ে হঠাৎ রোগীর কাপড় খুলে তাকে উলঙ্গ করে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে রোগী আত্মসচেতন হয়ে কাপড়টি ধরে রাখতে চায় আর 'ভোলা' ও তখন পালিয়ে যায় অর্থাৎ লোকটির স্মৃতি ফিরে আসে।" [৪০] 'ভোলা' নামের কোন অপদেবতার সৃষ্টি কোনদিনই হয় নি। এই 'ভোলা' কে নিয়ে তারাশঙ্করের এই গল্পটি লিখেছেন। ভূতেরা অন্ধকারের বাসিন্দা। এই ভূতেরা মায়ায় রাতের অন্ধকারে ভুলিয়ে নিয়ে যায় মানুষকে বিপথে। পরে তার দেহ পাওয়া যায় কোন খালের কাছে কিংবা জঙ্গলের ধারে। এরকমই এক ভূত 'ভোলা' নিতাই পাঁড়েকে টেনে নিয়ে যায়। শশীর চেষ্টায় সে বাঁচে। লেখক ভূতকে বিশ্বাস করেন নি। তিনি মনের ভুলের জন্যেই এমন হয় মনে করেন। মানুষ যদি একাগ্র চিত্তে কোন কিছু চিন্তা করে, তবে মানুষ এমন ভুল করে। ভূত সম্বন্ধীয় 'ভূতপুরাণ', 'অক্ষয়বটোপাখ্যানম্', 'স্বর্গলোকে' ভূমিকম্প প্রভৃতি উল্লেখ করা যেতে পারে।

এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে তারাশঙ্করের পিসীমা অসামান্যা ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী ছিলেন। সেকালের সমস্ত কুসংস্কারকে তিনি কিন্তু মেনে নিয়েছিলেন। কত বিচিত্র ভূত প্রেতের সন্ধান তিনি জানতেন, মারীভয়, মৃত্যুভয় প্রভৃতি থেকে সর্বদাই তিনি নয়নের-মণি তারাশঙ্করকে রক্ষার জন্যে বিভিন্ন দেব-দেবতার মাদুলী বেঁধে দিয়েছিলেন তার দেহে, সর্দির ভয়ে তারাশঙ্করকে সপ্তাহে তিন দিন স্নান করতে দিতেন। এছাড়া ছিল নানা বিধি নিষেধ। জগদীশ ভট্টাচার্য বলেছেন, "হাঁচি, টিকটিকি অশ্লেষা, মঘা, দিক্‌শূল, যোগিনী, পদে পদে নিষেধের ডোরে' বালক তারাশঙ্করকে বেঁধে রাখতে ব্যস্ত ছিলেন পিসীমা। কিন্তু তারাশঙ্কর ছেলেবেলা থেকেই ছিলেন স্বভাববিদ্রোহী। বাইরে থেকে যখনই কোনো বিধিনিষেধ তাঁর ওপর চাপিয়ে দেওয়া হত তখনই তাঁর শিশুসত্তা অস্বস্তি বোধ করত। সূক্ষ্ম মান অপমান বোধ, তীক্ষ্ণ আত্মমর্যাদা এবং আদর্শ জীবনের প্রতি আকর্ষণ বালক তারাশঙ্করের ছিল প্রধান চরিত্র ধর্ম।" [৪১] তাই পরবর্তী জীবনে তিনি কুসংস্কারের জাল ছিন্ন করতে পেরেছিলেন ডাইনী চরিত্রের মধ্যে মানবচেতনার ক্রন্দন শুনতে পেয়েছিলেন, আবার ভূতের ভুলোর ছলনাকে তিনি সবার কাছে অস্বীকার করতে পেরেছিলেন।

পাদটীকা

১। লোক বিশ্বাস ও লোকসংস্কার : ডঃ বরুণ চক্রবর্তী — পৃ. ১২-১৩

২। Man and his Superstitions (2nd Edn.) : Curveth Read — P-1

৩। Cultural Anthropology, Ch-XII Religion Man and the universe : Melville J. Herskovits — P-221

৪। The Outlines of Mythology (London) :Lewis Spence — P-5

৫। The Columbia Encyclopadia : — P-78

৬। লৌকিক সংস্কার ও মানবসমাজ : আব্দুল হাফিজ — পৃ. ১৭

৭। Totem and Taboo : Sigmund Freud — P-2

৮। Totemism and Exogamy : J. G. Frazer (Vol.1) — P-355

৯। সিগমুন্ড ফ্রয়েড/টোটেম ও টাবু (ভাষান্তর) : ধনপতি বাগ — পৃ. ৫

১০। ঋক সংহিতা ১০ম মন্ডল ১৬৫ সূক্ত।

১১। Encyclopaedia of Superstition : — P-53

১২। Myths of Peru and Mexico : Abanindranath Tagore P-26

১৩। লোকসাহিত্য / ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী : ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ লিখিত ভূমিকা পৃ. ২২

১৪। অলৌকিক নয় লৌকিক (২য় খন্ড) : প্রবীর ঘোষ পৃ. ১৩

১৫। লৌকিক সংস্কার ও মানব সমাজ : আব্দুল হাফিজ পৃ. ৬৯

১৬। The Science of Folklore : Alexander H. Kraappe (1964) P-203

১৭। হিন্দুসংস্কৃতির স্বরূপ (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ) : ক্ষিতিমোহন সেন পৃ. ৫৬

১৮। অলৌকিক নয় লৌকিক (২য় খন্ড) : প্রবীর ঘোষ পৃ. ১৯-২০

১৯। বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব) : ডঃ নীহাররঞ্জন রায় পৃ. ৩৩

২০। (ক) Social Change in Modern India : M. N. Srinivas P-2-3

২০। (খ) The English works of Raja Ram Mohan Roy (part-iv) : Sadharan Brahmo Samaj P-95

২০। (গ) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলী : প্রিয়নাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত (৩৯ সংখ্যক পত্র) পৃ. ৫০

২০। (ঘ) উনিশ শতকের সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা বিতর্ক রচনা : ডঃ অজয়েন্দ্রনাথ সরকার পৃ. ২৬৫

২১। ধাত্রীদেবতা : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ. ১১৩

২২। ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর : ডঃ মুক্তি চৌধুরী পৃ. ২৩৯

২৩। অলৌকিক নয় লৌকিক (২য় খন্ড) : প্রবীর ঘোষ পৃ. ৩৫

২৪। প্রাগুক্ত (১ম খন্ড) : পৃ. ২২০

২৫। তারাশঙ্কর : সময় ও সমাজ : আদিত্য মুখোপাধ্যায় পৃ. ৫১

২৬। The black Art (Arrow Books Ltd) 1966 : Rollo Ahmed P-13

২৭। তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ (৩য় খন্ড) ভূমিকা : জগদীশ ভট্টাচার্য পৃ. ৩৬

২৮। প্রাগুক্ত (২য় খন্ড) : পৃ. ৫৭

২৯। লৌকিক সংস্কার ও মানবসমাজ : আব্দুল হাফিজ পৃ. ১০৫

৩০। লোকশ্রুতি (ত্রৈমাসিক লোক সাহিত্য সংকলন : ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য পৃ. ৫১
আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত
শ্রাবণ। ১৩৭৪, ১ম সংখ্যা

৩১। প্রাগুক্ত : পৃ. ৫১

৩২। অলৌকিক নয় লৌকিক (২য় খন্ড) : প্রবীর ঘোষ পৃ. ২২৫

৩৩। বাংলা গল্প বিচিত্রা : ডঃ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় পৃ. ৭৭

৩৪। তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ (২য় খন্ড) : জগদীশ ভট্টাচার্য পৃ. ২৪৩-২৪৪

৩৫। তারাশঙ্কর : দেশকাল সাহিত্য : ডঃ উজ্জ্বলকুমার মজুমদার পৃ. ১৪২

৩৬।	আমার সাহিত্য জীবন (১ম খন্ড)	:	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	পৃ. ৮৪
৩৭।	তারাশঙ্কর স্মৃতিকথা	:		পৃ. ৪৬
৩৮।	আমার সাহিত্য জীবন (১ম খণ্ড)	:	তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়	পৃ. ১২৩
৩৯।	তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ (২য় খন্ড)	:	জগদীশ ভট্টাচার্য	পৃ. ২৭১
৪০।	শরীর ঘিরে সংস্কার	:	ভবানীপ্রসাদ সাহু	পৃ. ১৭০
৪১।	তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ (১ম খন্ড)ভূমিকা	:	জগদীশ ভট্টাচার্য	পৃ. ২০

* * * * * * * * * * * *